International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-IV, July 2024, Page No.10-18
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i4.2024.10-18

নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়: একটি অধ্যয়ন (নির্বাচিত নাটক অবলম্বনে)

রাণু রায়
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, সিকম স্কিলস্ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Siddheshwar Chattopadhyay is one of the dramatists in modern Sanskrit literature. He was not only a playwriter, but also a actor, dramatist and playdirector. He was born on 27th February,1918 in Nahata village of present day in Jessore district. He was directly involved in politics from his school days. He was imprisoned several times for this reason. The injustice, tyranny and corruption of post-independence India had scarred the playwriter. He raised his voice against lawlessness and corruption through his drama. The Eastern and Western dramas were involved in his entire pursuit. At the very beginning of the play Nandi, Sabha Puja, naming of characters, content of the play, characterization, Bharatavakya, exceptional novelty can be noticed everywhere. Originality can be seen in each of his plays. He revealed the nature of truth in every play. His plays focus on politics at the national level and international level. The purpose of this article is to analyze his contribution in the realm of his work on the history of sanskrit drama.

Keywords: Modern Sanskrit Literature, Exceptionalism, Originality, Politics, Individuality, Daily Life, Third Theatre, Alienation effect.

সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকগুলির মধ্যে নাট্যকার সিদ্ধেশ্বরের রচনাবলী সহৃদয় পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে আকর্ষিত করে। তিনি একাধারে নাট্যকার, সুদক্ষ নট, নাট্যতত্ত্ববিদ ও সর্বোপরি একজন নাট্যনির্দেশক ছিলেন। এছাড়াও তিনি ছিলেন নাট্যকার ব্রেশটের অনুরাগী, নিষ্ঠাবান, সাম্যবাদী ও স্বদেশপ্রেমী। তাঁর প্রতিটি নাটকে নাট্যভাষার নিরবদ্য সাবলীলতা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন বৈচিত্র্য, নান্দী, ভরতবাক্য সবকিছুতেই মৌলিকতা ও অভিনবত্বের পরিচয় দৃষ্ট হয়। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সামাজিক, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাসংক্রান্ত প্রভৃতি সমস্যা নাট্যকার তাঁর রচনাবলীতে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলার নহাটা গ্রামে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাতা প্রমোদা সুন্দরী দেবী। পিতা শরৎচন্দ্র পেশায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসা শৈশব কাল থেকেই। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে এবং দেশপ্রেমী হওয়ার অপরাধে ছাত্রাবস্থায় তিনি ব্রিটিশ শাসকের ক্রোধানলে পড়েন ও একাধিকবার কারাবরণ করেন। ফলশ্রুতি হল, তাঁর সারস্বত জীবনের শুভারম্ভ হয় অনেক দেরিতে। তিনি

ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন বড়। সেজন্য তিনি ছিলেন সকলের প্রিয় 'বুড়োদা'। বাল্যকালেই পিতা শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হয়। জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর ছিল না। বালক সিদ্ধেশ্বর আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরানোর জন্য রোজগারের চেষ্টা করেন। তাই তিনি জীবনের প্রথম দিকে যাত্রা দলের সখীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। ম্যাট্রিক পাশ করে ওভার শেয়ার পদে আসামের গৌরীপুর এস্টেটের সার্ভেয়ার পদে নিযুক্ত হন। প্রচলিত আছে যে, প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রথমা স্ত্রী অর্থাৎ যমুনা বড়ুয়ার ব্যক্তিগত সচিব হিসেবেও তিনি নিযুক্ত হন। যমুনা দেবী 'বৌরাণী' নামে পরিচিত ছিলেন। তরুণ সিদ্ধেশ্বরের বৌরাণীকে সংস্কৃত পড়ানোর দায়িত্বও ছিল। তিনি রাজশাহী জেলার বগুড়া কলেজ থেকে I .A. পাস করেন। এরপরে তিনি কলকাতায় আসেন। Economics নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু ইকনোমিক্স অধ্যয়নে বেশি খরচ থাকার জন্য তিনি ইকনোমিক্স নিয়ে পড়াশোনা করতে পারেননি। সিদ্ধেশ্বর জানতে পারেন যে, সংস্কৃত নিয়ে পড়াশোনা করলে বৃত্তি পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। তিনি ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর জন্য তাঁকে কিছুদিনের জন্য কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এরই মধ্যে গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত নিয়ে পড়াকালীন তিনি রাজশাহীর টোলেই কাব্যে আদ্য, মধ্য, উপাধি পাশ করেন ও কাব্যতীর্থ হন। পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকস্তরে কলা বিভাগে সর্বোচ্চ নাম্বার পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ishan Scholar সম্মান অর্জন করেন। ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর পাশ করেন। সাহেবগঞ্জ নিবাসী, Burma Shell কোম্পানির ইন্সপেক্টর মণীন্দ্রনাথ পাঠকের কন্যা হলেন শ্রীমতি রতন মালা। তাঁর সঙ্গে ১৯৫১ সালে সিদ্ধেশ্বর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বৃত্তি ছিল মাত্র ১০০ টাকা। ব্যক্তিগত জীবনে ও সারস্বত জীবনে রতন মালা দেবীর ভূমিকা তিনি বারবার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

তিনি কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত বিভিন্ন কলেজে যেমন দেশবন্ধু কলেজ, বৈষ্ণবঘাটা কলেজে, সেন্ট পলস্ কলেজ প্রভৃতিতে অংশকালীন অধ্যাপক রূপে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। কলকাতা থেকে বর্ধমান ১৯৬০-৬৪ সাল পর্যন্ত যাতায়াত করে অধ্যাপনার কাজ করার পর তিনি ১৯৬৪ সালে বর্ধমানে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করেন। তিনি অধ্যাপক গৌরীনাথ শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে গবেষণা শুরু করেন। সাগর নন্দীর 'নাটক লক্ষণ-রত্ন-কোশ' গ্রন্থটির উপরে গবেষণা করেন। এই গ্রন্থটির উপরে তিনি অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠ ও মননধর্মী গবেষণা করে ১৯৭৩ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি উপাধি লাভ করেন। তিনি ১৯৮৩ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ১২ বছর পর ১৯৭৮ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সালে গভর্নমেন্ট কলেজের P.G.Training and Research বিভাগে তিনি Associate Professor হিসেবে যোগদান করেন। তিনি সেখানে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ছিলেন। কলকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সাথে তাঁর আত্মার যোগ ছিল। তাঁর নাটকগুলিতে ব্রেশটের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই মহান নাট্যকার ১৯৯৩ সালে লোকান্তরিত হন।

সাহিত্য কালের দর্পণ। সমকালীন সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলার ঐতিহ্য সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রাচীন। ভরতমুনির তাঁর নাট্যশাস্ত্রে তৎকালীন সমাজের অভিজাতশ্রেণীর অন্ধকারময় দিক তুলে ধরেছেন। ঊনবিংশ-বিংশ শতকে এর ধারা ব্যাহত হয়নি। তার প্রমাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, পঞ্চানন তর্করত্ন, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ প্রমুখ পণ্ডিত। এর পরবর্তীকালে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, রমারঞ্জন

মুখোপাধ্যায়, সীতানাথ আচার্য প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। সমকালীন সময়ে রাজনৈতিক সংঘাত, অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়গুলি তৎকালীন জনজীবনকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল। রাজ্য-রাজনীতিতে দেখা যায় রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল। যা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। অর্থনৈতিক সংকট, প্রশাসনিক, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক সংঘাত, নির্বাচনে রিগিং, সন্ত্রাস প্রভৃতি সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত থাকার জন্য তাঁকে একাধিক বার কারাবাস করতে হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে অন্যায়-অনাচার, দুর্নীতি, রাজনৈতিক সংঘাত তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সংস্কৃত নাট্যকার হিসাবে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় পাঁচজন নাট্যকারদের মত লিখতে পারতেন শৃঙ্গার রস মূলক নাটক। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তার পরিবর্তে লিখলেন রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, ক্ষমতার লোভ, সাধারণ দরিদ্র মানুষের আর্তনাদ, ভোট প্রহসনের কদর্যের চিত্র ইত্যাদি বিষয়ক নাটক। নাট্যকারের প্রতিটি নাটকে মৌলিকত্ব, অভিনবত্ব থাকলেও সবার ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে মানবতাবাদ। তাই তিনি মানবাধিকারের জন্য সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের পক্ষে লড়াই করেছেন। তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে অন্যায়, দুর্নীতির বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি তাঁর রচনায় সমাজের শুধুমাত্র নির্মম ও রূঢ় বাস্তবকেই তুলে ধরেননি, সারস্বত সত্যেরও অন্বেষণ করেছেন সেখানে। নাট্যকার তাঁর নাটকে সমাজের অন্যায়ের প্রতি কখনো সোজাসুজিভাবে কখনো ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে তীক্ষ্ণভাবে বিদ্রূপ করেছেন।

নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় রচিত নাটকগুলি হল :

১) 'ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্' (১৯৭১),
২) 'অথ কিম্' (১৯৭৪),
৩) 'ননাবিতাড়নম্' (১৯৭৪),
৪) 'স্বর্গীয়হসনম্' (১৯৭৭)।

এছাড়াও তিনি ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় আরও অনেক সমৃদ্ধ সাহিত্য তিনি রচনা করেছেন।

নাট্যকার ড. সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের চারটি নাটকের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাটক হল 'ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্'। আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে লেখা অনবদ্য ব্যঙ্গনাটিকা হল 'ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্'। এই রূপকটি ১৯৬৭ সালে রচিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ এই রূপকটি ১৯৭১ সালে প্রকাশ করে। নাটকের প্রেক্ষাপট একটি পান্থশালা। তার মালিক হলেন স্বয়ং ভগবান এবং সহকারী কর্মচারী বিশ্বকর্মা। তাঁর একমাত্র বিবাহযোগ্যা কন্যা ধরিত্রী। তার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়েছে। বিবাহ করতে আগত পাত্রেরা সুন্দরী সম্পদ শালিনী ধরিত্রীকে প্রকৃতপক্ষে কেউ ভালোবাসেনা। কিন্তু তার দখল নিতে সবাই আগ্রহী। কেউ অর্থের জোরে, কেউ ক্ষমতার জোরে আবার কেউ আত্মীয়ের দাদার পরিচয়ে ধরিত্রীকে দখল নিতে চায়। শেষ পর্যন্ত ধরিত্রীর পতি নির্বাচিত না হয়েই নাটক সমাপ্ত হয়ে যায়।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে রাজনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে অনেক নাট্যকার নাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন যে, ধরিত্রীর পতি নির্বাচন সভার বারবার আয়োজন হলেও তা আজও চলছে। তিনি অসামান্য কৃতিত্বের সাথে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যাকে অবলম্বন করে 'ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্' নাটকটি রচনা করেছেন।

নাট্যকার নাটকের মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধ্যক্ষ নির্বাচন নিয়ে শক্তিশালী দেশগুলির দুর্বল দেশগুলির উপর অধিকার খাটানোর চেষ্টাকে বিদ্রূপ করেছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়ার কথা কার্যতঃ সম্ভব হয় না। অভিনব পরিকল্পনায় উপস্থাপিত নাটকটিতে নাট্যকারের মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাটকে নয়জন পুরুষ চরিত্র ও একজন স্ত্রী চরিত্র আছে। নাট্যকার নাটকের চরিত্রগুলির নামকরণে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রের নামগুলিও খুব তাৎপর্যবহ। যেমন- লঘুবঞ্চক, গাড্ডোলক, বরগুলম্বুক প্রমুখ। নাটকটিতে ধরিত্রী বলতে পৃথিবী এবং স্বয়ম্বর সভায় আগত পুরুষ চরিত্রগুলি এক একটি দেশকে উপস্থাপিত করেছে। নাট্যকার তাঁর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে বুঝেছেন ন্যায়নীতি, নিরপেক্ষতা প্রভৃতি তত্ত্বগুলি আজ শুধু কথার কথা মাত্র। নাট্যকার স্বকীয় প্রতিভায় চরিত্রগুলিকে নতুন ভাবে রূপদান করেছেন।

নাটক মানেই রাজা-রাণীর প্রেমের কাহিনী বা নিছক মনোরঞ্জন নয়। নাটকের মধ্য দিয়ে কিছু বার্তা দিতে হবে, যা সমাজ ও লৌকিক ক্ষেত্রে মঙ্গলদায়ক হবে। এর ফলস্বরূপ দর্শকমণ্ডলী অভিনয় দর্শনের মাধ্যমে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবে। সেই বার্তা দর্শকদের ভাবনা বিকাশে সাহায্য করবে। নাট্যকার নাটকের বিষয়বস্তু চয়নেও অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এই নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি গভীর বার্তা দিতে চেয়েছেন। দর্শক মণ্ডলীর ও পাঠককুলের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়ে নাটকটি সমাপ্ত হয়েছে।

এই নাটকে নাট্যকার নাট্যশাস্ত্রোক্ত নিয়মকে কখনো অনুসরণ করেছেন আবার কখনো করেন নি। নাটকে নান্দী আছে। কিন্তু তিনি নান্দীশ্লোকে কলিকাল দেবীকে প্রণাম জানিয়েছেন:

> “রাষ্ট্রাখ্যায়ানে সমধিষ্ঠিতা যা
> হিংসাভিধেয়া কলিকালদেবী।
> সমুদ্ধরত্বস্ত্রশতং দধানা
> মনুষ্যপিষ্টাং ধরণীমিমাং সা।।”[১]

নাট্যকার এই নাটকে বাংলা ভাষার প্রবাদ-প্রবচন সংস্কৃতে ব্যবহার করে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন:

> “নয়নে সম্মুখে সর্ষপপুষ্পানি বিকসন্তি।”[২] (চোখের সামনে সর্ষের ফুল ফুটেছে)

অথবা,

> “কর্ণয়োর্মধ্যে চ ঝিল্লীরবঃ সমুৎপাদ্যতে।”[৩] (কানের মধ্যে দিবারাত্র হাজার হাজার ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক)

কিংবা,

> “অপগতনিদ্রঃ সজৃম্ভং ছোটিকাং দত্ত্বা।”[৪] (ঘুম ভাঙার পরে তুড়ি দিয়ে হাই তোলে)

বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি দুর্বল দেশগুলিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। দুর্বল দেশগুলির কোন ভূমিকা থাকে না। ধরিত্রীকে সকলে নিজের দখলে পেতে চায়। শান্তিকামী দেশগুলি নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে বিশ্বশান্তির বা ধরিত্রীকে দখলে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে।

তাই সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় নাটকের প্রস্তাবনাতে লিখেছেন:

“প্রত্যহমেব সংবাদপত্রিকায়াং দৃশ্যতে কতি রণধুরন্ধরা রাষ্ট্রনায়কা ধরণীমিমাং মনুষ্যরহিতাং কর্তুং ব্যবসিতাঃ।অদ্ভূতমারণযন্ত্রাবিষ্করণে প্রতিস্পর্ধা তেষামস্মাকং হৃৎকম্পং জনয়তিতরাম্।”[৫]

(প্রতিদিন পত্রিকায় দেখি জাতির কত যুদ্ধবীর এই পৃথিবীকে জনশূন্য করতে বদ্ধপরিকর। বিস্ময়কর মারণযন্ত্র আবিষ্কারে তাদের প্রতিযোগিতা আমাদের আরও কাঁপিয়ে দেয়।)

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় নাটকে নতুন নতুন আঙ্গিকের উদ্ভাবন করেছেন। তারই নতুন আঙ্গিকের ফসল “অথকিম্”। তিনি নাটকে ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিক দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি তীব্র কষাঘাত করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ অঙ্গ হলো কার্যারম্ভে মঙ্গলাচরণ। বিঘ্ননাশের জন্য সংস্কৃত নাটকের নিয়ম অনুযায়ী অভিনয়ের পূর্বে মঙ্গলাচরণ করা উচিত। বিশ্বনাথ কবিরাজ ‘সাহিত্যদর্পণ’ গ্রন্থে বলেছেন:

“যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্বং রঙ্গবিঘ্নোঽপশান্তয়ে।
কুশীলবাঃ প্রকুর্বন্তি পূর্বরঙ্গঃ সউচ্যতে।।
প্রত্যাহারাদিকান্যঙ্গান্যস্য ভুয়াংসি যদ্যপি।
তথাঽপ্যবশ্যঃ কর্ত্তব্য নান্দী বিঘ্নোঽপশান্তয়ে।।”[৬]

(অভিনয় আরম্ভের পূর্বে রঙ্গের বিঘ্নশান্তির জন্য নটগণ যে মঙ্গলাচরণ করেন, তাহা পূর্বরঙ্গ। যদিও এই পূর্বরঙ্গের প্রত্যাহার প্রভৃতি নানা অঙ্গ আছে, কিন্তু নাট্য নির্বিঘ্ন করবার উদ্দেশ্যে নান্দী নামে মঙ্গলাচরণ অবশ্য কর্তব্য।)

নান্দীর লক্ষণে সাহিত্য দর্পণকার বলেছেন :

“আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মা ৎপ্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা।।”[৭]

(দেব দ্বিজ ও নৃপতি ইত্যাদির স্তুতিবাদ নটগণ প্রয়োগ করে থাকেন, তাতে আনন্দ উৎপন্ন হয় বলে একে নান্দী বলা হয়।)

নাটকের শুরুতেই নাটকের গতানুগতিক রীতিকে অনুকরণ করেন নি। এই নাটকেও নান্দী শ্লোকে তিনি ‘সমুদ্ভট’ নামক এক উদ্ভট দেবতাকে প্রণাম জানিয়েছেন:

“পুরাতনং যাত্যধুনা বিনাশং
নবীনমদ্যেহ বিভাতু কামম্।
নমাম্যতোঽহং প্রসমীক্ষ্য কালং
সমুদ্ভটাখ্যং নবনাট্যদেবম্।।”[৮]

(আজ পুরোনোর ক্ষয়।
আর নতুনের জয়।
কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে
করি নমস্কার
নাট্যের নতুন দেবতাকে

“সমুদ্ভট” নাম যার।।)

এখানেই নাট্যকার অন্যান্য নাট্যকারের থেকে স্বতন্ত্রতা লাভ করেছেন।

নাট্যকার সুত্রধারের বক্তব্যের মাধ্যমে সমাজের কদর্য রূপ তুলে ধরেছেন:

“পরমদ্যত্বে সর্বং জাতম্ অসংস্কৃতম্ দেহে, চিত্তে, সমাজে সংস্কৃতস্য গন্ধোঽপি নাস্তি, অভিনয়শ্চ ভবতি সর্বত্রৈব মার্গে, হট্টে, ঘটে, পরিবারে, বিদ্যালয়ে, বিধানসভায়ামপি।”[৯]

(দেহ, মন, সমাজ কোথাও সংস্কৃতের নামগন্ধ নেই, আর অভিনয় তো চলছে সর্বত্র- হাটে, মাঠে, ঘাটে, পরিবারে, বিদ্যালয়ে, বিধানসভায়)

নাটকে সূত্রধারের সংলাপে ‘অভিনয়’ শব্দের মাধ্যমেতিনি সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন।

নাট্যকার নাটকে দর্শকদের বাস্তবজ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্নও করেছেন:

“মন্যে বাস্তববিমুখাঃ সর্বে ভবন্তঃ। নায়ং তিরস্কার, স্বমপ্যহং ভবদ্গোষ্ঠীগত এব।”[১০]

(মনে হয় আপনাদের সঙ্গে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক কম। না না কথাটা অন্যভাবে নেবেন না ,আমি আসলে আপনাদের দলেরই একজন।)

ব্যঞ্জনার মাধ্যমে “সমাজের নিয়ন্তক” রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ হেনেছেন:

“আগচ্ছতু তত্রভবান্”।[১১]
(‘তাঁকে’ আসতে দিন।)

এই ভাবেই নাটকের প্রতিটি সংলাপেই অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

নাট্যকার নাটকে ভাষার প্রয়োগে অন্যান্য নাট্যকারদের থেকে ভিন্ন। তিনি সাধারণ মানুষের আটপৌরে বা সাদামাটা কথ্য ভাষাকে অসাধারণ শিল্প দক্ষতায় নাটকে সংযোজন করেছেন:

“পরং বস্ত্রেন্ধন-তৈল-তণ্ডুল-লবণাদীনাং—”[১২]
(কিন্তু চাল-ডাল-তেল-নুন, কাপড়-চোপড় এগুলোর----)

নাটকে সাধারণতঃ শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু নাটকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা, সহজবোধ্য সংস্কৃতভাষা প্রয়োগ করেছেন। আবার নাটকের মধ্যে তিনি ইংরেজি শব্দও প্রয়োগ করেছেন।

যেমন- Sorry, Nonsense, Rubbish।[১৩]

বিশাখদত্ত রচিত ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকে কৌটিল্য রক্তপাত ছাড়াই শুধুমাত্র কূটনীতির দ্বারা নন্দবংশের অমাত্য রাক্ষসকে পরাজিত করে স্বপক্ষে এনেছিলেন। কিন্তু বর্তমান রাজনীতির স্রোত বিপরীতে বইছে। রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে দেশ, সমাজ, পরিবার সর্বত্রই। তাই সিদ্ধেশ্বর নাটকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে দর্শকদের সচেতন করে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়েছেন।

নাট্যকার রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে নাটকটি রচনা করলেও সেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত, দরিদ্র মানুষের আর্তনাদটিও সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন:

“গৃহে যে বর্তন্তে কানিচিদ্ ব্যাত্তমুখানি গহ্বরাণি ভরণায় তেষাং ভ্রমত্যয়ং জনো মার্গান্মার্গম্।”[১৪]
(বাড়িতে কতকগুলি ক্ষুধার্ত হাঁ -করা মুখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই গর্ত গুলো ভরানোর জন্য এই মানুষটা পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।)

এই নাটকেও বাংলায় প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের সুন্দর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন:

“গলে হস্তং দত্ত্বা হরিষ্যন্ত্যেতে।”[১৫](ঘাড় ধরে আদায় করা হবে)
“কিমেব হযবরলং কথয়তি।”[১৬] (কি এসব হযবরল বকে যাচ্ছেন)

নাট্যকার ‘অথকিম্’ নাটকের চরিত্রগুলির নামকরণে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকে কোন চরিত্রের নামকরণ করেন নি। ব্যঞ্জনবর্ণ ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ এইগুলি পুরুষ চরিত্র এবং স্বরবর্ণ আ, ঊ এগুলি স্ত্রী চরিত্র রূপে চিত্রিত করেছেন। চরিত্রগুলির কোন ব্যক্তির নাম না দিয়ে তিনি দল বা পার্টিকে বুঝিয়েছেন।

সাহিত্য দর্পণকার প্রশস্তির লক্ষণে বলেছেন:

“নৃপদেশাদিশান্তিস্তু প্রশস্তিরভিধীয়তে।।”[১৭]
(নৃপ, দেশ, আদি শব্দে দেবতা প্রভৃতির শান্তিকে ‘প্রশস্তি’ বলা হয়।)

নাটকের কোন পাত্র যখন প্রশস্তি বাক্য পাঠ করে তখন তাকে ‘ভরতবাক্য’ বলে। অর্থাৎ সংস্কৃত নাটকের শেষে ভরতবাক্যে মঙ্গলময় বার্তার দ্বারা আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। কিন্তু সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই নাটকে গতানুগতিক রীতিকে ত্যাগ করে আত্মকেন্দ্রিক, হৃদয়হীন মানুষের চরিত্র উন্মোচন করেছেন ভরতবাক্যের মধ্য দিয়ে:

“কালস্য গতিমালোচ্য সাম্প্রতং প্রার্থয়ামহে।
অস্তু মে মঙ্গলং নিত্যং ভবতামস্তু বা ন বা ।।”[১৮]
(কালের গতি দেখে শুনে
চাওয়া এখন আমার
মঙ্গল হোক আমার শুধু
হোক বা না হোক তোমার।।)

আধুনিককালের পরিস্থিতি দেখে নাট্যকার বুঝতে চেয়েছেন, এই সমাজে বাঁচতে গেলে নিজেকেও স্বার্থপর হতে হবে, আর নিজের মঙ্গল প্রার্থনা করতে হবে। বস্তুতঃ এটি একটি প্রবহমাণ ভাবনা। সমাজের এই আত্মকেন্দ্রিক দিকের প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করে তিনি এই কথা বলেছেন। দর্শকদের সচেতন করার উদ্দেশ্য যাতে সকলে স্বার্থপরতা ভুলে মানবতার জয়গান করে।

বাংলার নাট্য জগতে থার্ড থিয়েটারের পুরোধা বাদল সরকারকে বলা হয়। তেমনি সংস্কৃত নাট্যজগতে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে থার্ড থিয়েটারের পুরোধা বলা যেতে পারে। হর্ষদেব মাধব, রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী প্রমুখ সংস্কৃত নাট্যকারদের নাটকে থার্ড থিয়েটারের প্রভাব অপরিসীম। তবে সিদ্ধেশ্বরের নাটকে ভরত ,A-Effect, Absurd Drama সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের নাট্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে এই নাটকে। তিনি দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে সীমারেখা মুছে দিয়েছেন। এই নাটকে দর্শকও একজন অভিনেতা। সংস্কৃত নাটককের গতানুগতিকতার গণ্ডী পেরিয়ে তিনি

তাঁর নাটকে আধুনিকতার আলোকে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। শোনা যায়, তিনিই প্রথম ভারতীয় দক্ষিণ-এশীয় মঞ্চে ব্রেশেটকে উপস্থাপন করেছেন।

সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, আধুনিক সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাম স্বমহিমায় বিরাজিত। নাটকগুলিতে নাট্যকারের স্বীয় পরিকল্পনাও স্বতন্ত্রতা এক অভিনবত্ব স্থান লাভ করেছে। নাট্যকার নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত রীতিকে কোন কোন স্থানে উপেক্ষা করলেও তাতে নাটকীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থেকেছে। নাটকের চরিত্রের কথোপকথন হয়েছে সহজ, সরল ও সাদামাটা প্রচলিত কথ্যভাষায়। নাট্যকার দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে সীমারেখা মুছে দিয়ে অভিনেতাকে দর্শকের মধ্যে এনেছেন। চরিত্রগুলির নামকরণেও তিনি মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রতিটি নাটকে আমরা A-Effect বা Alienation effect দেখতে পাই। প্রতিটি নাটকের সর্বত্র এক অপূর্ব সুন্দর ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়েছে। নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতে বাংলার প্রবাদ প্রবচনকে স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করেছেন। বলা বাহুল্য নাটক, নাট্যকার ও নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রতিটি রচনায় তিনি মৌলিকত্বের ছাপ রেখেছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে বিংশ তথা একবিংশ শতকের আধুনিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাম অমর অক্ষয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র:

১। ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্, বুড়োদা রচিত, কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদা, ১৩৭১, পৃষ্ঠা - ২।
২। ঐ, পৃষ্ঠা-২।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা-২।
৪। ঐ, পৃষ্ঠা-৩।
৫। ঐ, পৃষ্ঠা-১।
৬। বন্দোপাধ্যায় শ্রী অশোককুমার, সাহিত্যদর্পণঃ, (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১২, পৃষ্ঠা – ৬।
৭। ঐ, পৃষ্ঠা – ৭।
৮। চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর, বুড়োদা বিরচিত, অথ কিম্, ঋতা চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা -১।
৯। ঐ, পৃষ্ঠা - ১-২।
১০। ঐ, পৃষ্ঠা - ১।
১১। ঐ, পৃষ্ঠা - ৩।
১২। ঐ, পৃষ্ঠা - ৮।
১৩।ঐ, পৃষ্ঠা - ২।
১৪। ঐ,পৃষ্ঠা - ৪।
১৫। ঐ,পৃষ্ঠা - ১৯।
১৬। ঐ, পৃষ্ঠা - ২১।
১৭। বন্দোপাধ্যায় শ্রী অশোককুমার, সাহিত্যদর্পণঃ, (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১২, পৃষ্ঠা – ৬১।

১৮। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বুড়োদা বিরচিত অথ কিম্, ঋতা চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৯ , পৃষ্ঠা - ২৪।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। ধরিত্রী-পতি-নির্বাচনম্, বুড়োদা রচিত, কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদা, ১৩৭১,
২। চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা) ও তাঁর রচিত অথ কিম্, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬
৩। চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৯
৪। ঘোষাল, বনবিহারী. অর্বাচীন (আধুনিক) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস. আগরতলা: পারুলপ্রকাশনী, ২০২২
৫। ভট্টাচার্য ড. পরমেশ ও মাইতি খোকন, সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বিরচিত ‘অথ কিম্’, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০২৩
৬। বন্দোপাধ্যায়, শ্রী অশোককুমার, সাহিত্যদর্পণঃ, (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ), শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১২